শিক্ষার মান বৃদ্ধির সবক কেমন হওয়া উচিত

বন্ধুরা প্রায়ই বলেন, স্বপ্নেই যদি খাবো আলুভর্তা-বেগুনভর্তা, ডাল কেন? –খাবো পোলাও-বিরিয়ানি, রাবড়ি-ক্ষীর, রাজভোগ ইত্যাদি, 'মনে যারে চায় রে বন্ধু, দিলে যারে চায়'। বাস্তবে খেতে গেলে পকেটের দিকে, আবার কখনো ডাক্তারের পরামর্শের দিকেও তাকাতে হয়। যাকে আমরা বলি নিখাদ বাস্তবতা। 'কাট ইওর কোট একোরডিং টু ইওর ক্লোথ'। আমরা সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে দাঁড়িয়ে অনেক কথাই বলি। কল্পনা ও মুখ আছে, তাই কখনো আখড়া জেতার জন্যও বলি। স্বপ্নে খাওয়া আর আখড়া জেতার মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবানুগ, বাস্তবায়নযোগ্য, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চায়। নইলে 'যাহা পূর্বং' হয়েছে 'তাহাই পরং' হবে, এটাই স্বাভাবিক। পরিকল্পনা প্রণয়নে বিষয়টা মনে রাখা জরুরি। এদেশে জনশিক্ষার ও প্রশিক্ষণের নামে প্রজেক্টেরও অভাব নেই, আবার টাকা বণ্টনেরও ঘাটতি নেই। ঘাটতি পরিকল্পিত কাজের সাথে কাজ বাস্তবায়নের। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর থেকে দেশ গড়ার নামে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য তো আমরা কম কথা বলিনি, কম কাজও করিনি, বাজেট বরাদ্দও নেহায়েত কম ছিল না। তবে এ দশা হলো কেন? মান ক্রমশ নিম্নমুখী হলো কেন? আমার মনে হয়, আমরা কথা বলেই ক্ষান্ত হই না, মুখ দিয়ে ঠেলে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে চলে যায়, বাস্তবতা তোয়াক্কা করি না। হয়তো জাগ্রত বিবেকবোধ ও আত্মজিজ্ঞাসার কারণে সৃষ্ট কোনো অনুশোচনাই আমাদের মনে রেখাপাত করে না তাই। শিক্ষার মান বাড়াতে আমরা বাজেটের কথা বলি। বাজেট বরাদ্দ বাড়ালেই, পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করতে পারলেই কি শিক্ষার মান বাড়তো? যে সব প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ হয়েছে, তাদের মান কি বেড়েছে? অসুবিধাটা কোথায়! সাক্ষরতার হার বেড়েছে মানি, শিক্ষার হার ও মান কি বেড়েছে? সবে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলো। পাশের হার একটু কমে গেছে। আমরা কেউ কেউ এতে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছি। পাশের হারের সাথে শিক্ষার মানের কি সম্পর্ক বুঝলাম না। দশটা বছর ধরে লেখাপড়া করে শিক্ষার ভিত গড়ে না উঠলে শুধু এসএসসি পরীক্ষার সময় হঠাৎ মান আসবে কোত্থেকে? শিক্ষার মান কি কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় ভালোমতো উদ্‌গার করে একটা গ্রেড অর্জন করতে পারলেই বেড়ে যায়? আমরা সবকিছুতেই সর্টকাট পদ্ধতির আবিষ্কারক। শিক্ষার উন্নতিতে কোনো সর্টকাট পদ্ধতি বলতে কিছু নেই। মান বৃদ্ধি দু-এক বছরের বিষয়ও নয়। শিক্ষা বিষয়টা এমন যে, প্রথমেই শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ থাকতে হবে। শিক্ষণীয় বিষয় শিখতে হবে, তা নিয়ে ভাবতে হবে, অনুশীলন করতে হবে, অর্জন করতে হবে, বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। এ নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক ও পরিবেশের ভূমিকাই প্রধান। এদেশে কি শিক্ষার পরিবেশ আদৌ আছে?

চাবুক মেরে মজুরকে খাটিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়; ঠেলাগাড়ি হলে একটু ঠেলে জোর করে কিছুদূর এগিয়েও দেওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষা কেউ নিতে না চাইলে জোর করে দেওয়া যায় না। এটা একটা মানসিক ব্যাপার এবং মানসিক প্রস্তুতিরও ব্যাপার। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষক ও অভিভাবকের উচিৎ ছাত্রছাত্রীকে মানসিকভাবে উদ্বীপিত করা, উৎসাহিত করা, শিক্ষার আগ্রহ তৈরি করা, শিক্ষা নিতে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। বর্তমানে ক্লাসে তেমন একটা লেখাপড়া হয় না। শিক্ষকের গরজও কমে গেছে। 'তোমারে করেছি বড় এই গর্ব মোর' ইচ্ছা বিলীন হয়ে গেছে। অভিভাবকমহলের সক্রিয় সহযোগিতায় বাসায় বসিয়ে টিউটরের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করতে হয়। দিনে দিনে এটা অভ্যাস ও রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। এখান থেকে ফিরে আসার কোনো চেষ্টাও আমরা করিনে। শিক্ষার উন্নয়নে যত টাকা ব্যয় করে যত প্রজেক্টই হাতে নিই, শিক্ষার অবস্থা যে তিমিরাবগুণ্ঠিত হয়ে পড়ে পড়ে খাবি খাচ্ছে, সেখানেই পড়ে থাকে। শিক্ষার উন্নয়নে ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশাল অঙ্কের যে প্রজেক্ট নিই, তার ফলও অতি অল্প দিনের ব্যবধানে দিনের আলোতে পরিষ্কার হয়ে যায়। সবকিছুকেই আমি অদৃষ্টের উপর দোষ চাপিয়ে 'কপাল খারাপ', 'জন্মেছি এই দেশে' বলে চালিয়ে দিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে

শিখেছি। আবার পত্রিকায় কিছু 'অপ্রত্যাশিত কটু কথা' লেখালেখির সুবাদে আমার মতো মাস্টারসাহেবের লেখাপড়ার চর্চা বাড়ে। এটাইবা কম কী! জাতি হিসেবে তো আমরা বই পড়া ভুলতে চলেছি। কিন্তু পত্রিকায় লিখে আদপে সংশ্লিষ্ট কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় কি না, এ নিয়ে আমার সন্দেহ বেশুমার। বরং এতে অনেকের বিরাগভাজন হই। 'উচিত কথায় খালু বেজার' হয়।

আমার মাথায় ঘুরপাক খায়, এভাবেই কি শিক্ষা চলবে, না এর কোনো পরিবর্তনের ইচ্ছে আমাদের আদৌ আছে? এদেশের রাজনীতি নিয়ে আমরা এতই বিমোহিত হয়ে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছি যে, এদেশে রাজনীতি ছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই। এটাই সবচে বড় সমস্যা। এ সমস্যার কাছে অন্য সবকিছুই কম গুরুত্বপূর্ণ। এটা সহসা নিবারণ হবার নয়! অথচ এই কুটিল রাজনীতির সমস্যারও এমন সমাধানের ব্যবস্থাও হাতে আছে যে, এদেশে আগামী একশ বছরেও আর কোনো রাজনৈতিক সমস্যা হবে না। কিন্তু সমাধান নেওয়ার লোক তো নেই। এদেশে শিক্ষিত-জ্ঞানী ব্যক্তিরা, যাদের সমস্যা সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা আছে তারা উপেক্ষিত, লাঠিয়াল বাহিনীর কদর বেশি। এদেশের মহান ও চিরমহান রাজনীতিবিদরা এদেশকে একমাত্র তাদের দেশ মনে করেন। এদেশ শাসনে রাখা তাদের একছত্র অধিকার। অন্য কোনো নাগরিকদেরও যে এদেশে কথা বলা, দেশ নিয়ে ভাবার অধিকার, ভুল ধরিয়ে দেবার অধিকার আছে, এটা তারা মুখে স্বীকার করলেও কার্যত মন থেকে মানেন না।

শিক্ষার অবস্থা দেখার জন্য আমি এদেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি। এই দেখার মধ্যে একটা সত্য বেরিয়ে এসেছে। আগেকার সময়ে গ্রামের পরিবেশে স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে অনেক ছাত্রছাত্রী শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে উঠে আসতো। দেশের বড় বড় পদেও যেত। এ সংখ্যা কিন্তু বর্তমানে যারপরনাই কমে গেছে। শহরের অভিভাবকরা হয়তো ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন বলেই তারা বর্তমানে ভালো করছে। পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু গ্রামে দেখলাম, অভিভাবকবৃন্দ শিক্ষাসচেতন, ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে। ড্রপ-আউটের সংখ্যা কম। আবার দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে দেখলাম, অনেক বাপ-মা শিক্ষাসচেতন নয়, শিক্ষার পরিবেশও ভালো নয়, বংশ পরম্পরায় লেখাপড়া শিখছে না। কোনো কোনো বাড়িতে হঠাৎ করে কেউ লেখাপড়ায় এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যরা একটু সামনে এগিয়েই ড্রপ-আউট কিংবা প্রথম থেকেই নিরক্ষর। আজকাল ফাইভ বা এইট পর্যন্ত পড়াকে পড়া বলা যায় না। স্কুলে নামেমাত্র আসা-যাওয়া করেছে। এমন যৎসামান্য শিক্ষাই শিখছে যে, কয়েক বছর চর্চা না থাকলেই ফাইভ-পাশ, এইট-পাশ বা আদৌ কিছু না-পাশ– সবারই একই অবস্থা। দৈনিক পত্রিকাটাও পড়ে না বা পড়তে পারে না। এসবের জন্য আমি আঞ্চলিকভাবে শিক্ষার পরিবেশ ও অভিভাবকদের শিক্ষা বিষয়ে চিন্তাধারাকে দায়ী করতে চাই।

মহান রাজনীতিবিদদের বর্তমান অনুসারীদেরকে এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নের ভার না দেওয়া ভালো। শিক্ষার কোনো কমিটিতে না রাখাও ভালো। তারা এখন এসব নিয়ে আদৌ ব্যস্ত নয়। এ নিয়ে তাদের মনে কোনো ভাবনাও নেই। তাদের ঝোঁক ক্ষমতাকে আকড়িয়ে ধরার দিকে, উন্নয়ন প্রজেক্টের দিকে, ক্ষমতাধর হওয়ার দিকে। এলাকার কোনো মেম্বর ও চেয়ারম্যানরাও যার যার বিভিন্ন ধান্দায় মহাব্যস্ত। এসব সত্য কথা বলে কারো মনে আঘাত দিতে চাইনে। এলাকার শিক্ষার উন্নয়ন করার তাদের সময় কোথায়! তারা যে পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করে নির্বাচিত হয়েছেন, তার কমপক্ষে দশ গুণ টাকা উঠিয়ে নেওয়ার কাজে ব্যস্ত। তাছাড়া তাদের রাজনীতি (?) আছে না! শিক্ষার উন্নতি করতে গেলে সরকারের সহযোগিতা লাগবে কিন্তু তাদের গৃহপালিত গ্রামে-গঞ্জের মহান নেতা দিয়ে নয়। শিক্ষাঙ্গনে এসে তারা শুধু দুর্গন্ধ ছড়ায়। বরং দুধে গোচোনার ছিটেফোটা একটু পড়লেই পুরো দুধটা নষ্ট হয়ে যাবে। প্রাইমারি, হাইস্কুল ও কলেজকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। দলমত নির্বিশেষে এলাকার জ্ঞানী-সুশিক্ষিত লোকদেরকে শিক্ষার উন্নয়নে এগিয়ে আনতে হবে, জনসেবায় সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদেরকে সমাজ উন্নয়নে জায়গা করে দিতে হবে। কোনো টাকা খরচের দরকার নেই। সম্মানটুকু দেখালেই চলবে। প্রতিটা স্কুলেই শিক্ষক-

ছাত্র-অভিভাবক– এই ত্রি-পক্ষীয় আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। পার্শ্ববর্তী কোনো কলেজের অধ্যক্ষ বা সিনিয়র কোনো শিক্ষককে দলপতি বানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই টীম সকলে মিলে কোনো স্কুলের সার্বক্ষণিক তদারক করবে। টীম প্রয়োজনে শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে, বাড়িতে কিভাবে ছেলেমেয়েকে সামলাবে তার প্রশিক্ষণ অভিভাবকদের দেবে। শিক্ষকদের নিয়ে নিয়মিত সভা করবে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নতি পরীক্ষা করবে। স্কুলে শিক্ষা না শেখার জন্য প্রথমেই শিক্ষককে জবাবদিহি করতে হবে, অতপর অভিভাবক জবাবদিহি করবে। পরিবেশটাকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে। থানা ও জেলা শিক্ষা অফিসার পুরো বিষয়টা কো-অর্ডিনেট করবে। জেলা প্রশাসনের কেউ বাধ্যতামূলকভাবে এটাকে তদারক করবে।

অধিকাংশ শিক্ষক নিজের বাড়িতে থেকে বাড়ির কাজে বেশি ব্যস্ত থাকে। এর ফাঁকে একবার স্কুলে হাজিরা দিয়ে আসে। বিষয়টা নিয়ে অনেক ভাবার অবকাশ আছে। গ্রামের লোক ঐ শিক্ষকের কাজে অমনোযোগিতার জন্য তেমন কিছু বলতেও চায় না। বিষয়টা শিক্ষার মান উন্নয়নে দারুণভাবে ভোগাচ্ছে। এর সাথে প্রাইভেট টিউশনির আপদও জড়িয়ে গেছে। এদেশে শিক্ষকদের বেতন কম, মর্যাদা কম, শিক্ষার মানও ক্রমশ কমছে– এগুলোর প্রতিকার দরকার, এ নিয়ে আমি একমত পোষণ করি। কিন্তু বেতন কমের অজুহাতে দায়িত্ব পালনে অনীহা, জবাবহীনতা, কর্মশৈথিল্য কোনোক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। যত কথা আমরা কেন্দ্র থেকে বলি না কেন, এসব তদারক করার লোক মাঠ পর্যায়ে কার্যত নেই। এটাই প্রধান সমস্যা।

শিক্ষার মান অর্জনে শৈথিল্য অর্থ জাতিকে ধীর গতিতে ধ্বংস করার শামিল। শিক্ষাকে আমরা গুরুত্ব না দিয়ে রাজনীতিকে গুরুত্ব দিতে শিখেছি বলেই আমাদের এত দুর্গতি। সরকার যতভাবেই প্রাইভেট টিউশনির আইন প্রণয়ন করুক না কেন, কার্যত আইনের কোনো বাস্তবায়ন নেই। খলের ছলের অভাব হয় না। অধিকাংশ স্কুল-কলেজ এখন শিক্ষাঙ্গন নয়, হয়ে গেছে প্রাইভেট টিউশনি সংগ্রহ করার উৎকৃষ্ট মিলনকেন্দ্র। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, শিক্ষা বিভাগ ও প্রতিটি এলাকায় একটা করে সচেতন-সুশিক্ষিত টীম শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যথেষ্ঠ। দরকার উদ্দেশ্যভিত্তিক কাজ ও ইচ্ছার মধ্যে আন্তরিকতা। এরা কিভাবে কাজ করবে তারও একটা গাইডলাইন নিশ্চয়ই দেওয়া যায়, যা এত অল্প পরিসরে সম্ভব নয়। মূলত আমরা বাস্তবে যে রাজনৈতিক উপর-টপকা নীতি, আদর্শ ও সততায় বিশ্বাসী, তাতে দেশে শিক্ষামানের উন্নয়ন কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। হাড়ির ভাত একটা টিপলেই পুরো হাড়ির খবর পাওয়া যায়। যদিও কথাটা বললে কোনো না কোনো পক্ষ আমার দিকে তেড়ে আসতে পারে। সমাজে মানবতা, ন্যায়বিচার, সততা, নৈতিকতা, বিবেক না থাকলে শুধু বইয়ের পৃষ্ঠাতে এসব থাকলে শিক্ষায় মানবতা ও নৈতিকতা থাকে না। নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব ও ন্যায়বিচার বিবর্জিত শিক্ষা আদৌ কোনো শিক্ষা নয়, আমাদের দেশে এটাই চলছে। মানুষের মধ্যে 'মানবতা' আছে বলেই নাম 'মানুষ' হয়েছে। 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' বলাটা ভুল হবে; এটা দারুণ অন্যায়ও বটে। আমরা চিন্তা-চেতনা ও কর্মে অন্য কোনো প্রাণির মতো হবো, আবার নাম দেবো সৃষ্টিসেরা মানুষ, তা হয় না। শিক্ষা নিয়ে, শিক্ষাঙ্গন নিয়ে দলবাজিও করবো, আবার শিক্ষার উন্নত মানও চাইবো, তা কীভাবে সম্ভব? তাহলে তা হবে 'সোনার পাথর বাটি'র মতো। আগে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এদেশে আদৌ আমরা শিক্ষার মান বাড়াতে চাই কী-না। চাইলে– খাতা-কলমে, বক্তৃতায়, না বাস্তবে? তারপর ইচ্ছার যথাযথ বাস্তবায়ন। বাস্তবায়নে আন্তরিক সদিচ্ছাই যথেষ্ঠ।

(১২ আগষ্ট ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।